প্রতিধ্বনি the Echo

Pratidhwani the Echo

A Peer-Reviewed Indexed International Journal of Humanities & Social Science

Published by: Dept. of Bengali

Karimganj College, Karimganj, Assam, India

Website: https://www.thecho.in

ISSN: 2278-5264 (Online)

ISSN: 2321-9319 (Print)

রমাপদ চৌধুরীর ‘বনপলাশির পদাবলী’ : সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব ও জন্মভূমে নিঃসঙ্গ গিরিজাপ্রসাদের ট্র্যাজেডি

পরিমল চন্দ্র দাস

Abstract

Ramapada Chowdhuri is a great novelist of Bengal in the post-Independence era; and many of his works deserve being classified as ‘modern classics’. From his first novel ‘Pratham Prahar’ (1954) to his ‘Pashchadpat’ (2005) he made fifty successful experiments and also wrote many short stories. Ramapada’s novels usually cover different dimensions of contemporary urban middle class life. In ‘Bonpalashir Padabali’ (1962), which owned him ‘The Rabindranath Tagore Memorial International Prize’, Ramapada Chowdhuri has shown a sharp contrast between the life of rural and urban middle classes of Bengal. The novel deals with the plight of Girijaprasad on his return to the birthplace after serving many years in an urban area. Though a native, he could not adjust with the changing life of the village in the post-independent era. In fact, it is defeat and not success which is the crux of Ramapada’s narration. In this paper a discussion is maid on the tragedy of Girijaprasad, emanating from the corruptions of erstwhile idyllic rural life in times of rapid urbanization, mechanization and materialization.

Key Words: *Modern-classics, human values, development planning, tragic retired life.*

ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী গ্রামীণ জীবনের কথাকার নন; তিনি মূলত নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার। বিগত শতাব্দীর সপ্তম দশকে লেখা রমাপদ চৌধুরীর একটি প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাস ‘বনপলাশির পদাবলী’ (১৯৬২) গ্রামজীবনকে নিয়ে লেখা তাঁর প্রথম ও শেষ উপন্যাস। গ্রাম নিয়ে উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা না থাকলেও, একসময় ‘দেশ’ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষের সস্নেহ অনুরোধেই তিনি এই উপন্যাসটি রচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন। ‘বনপলাশির পদাবলী’ রচনার জন্য ২০১১ খ্রিস্টাব্দে ঔপন্যাসিক The Indian Institute of Planning and Management থেকে ‘Rabindranath Tagore Memorial International Prize’ লাভ করেন।

রমাপদ চৌধুরী গ্রামে জন্মান নি, তাঁর জন্ম রেলশহরে খড়্গাপুরে। শৈশব থেকে যৌবনসন্ধি পর্যন্ত সময় কাটিয়েছেন তিনি খড়্গাপুরে। কিন্তু গ্রামজীবনের সঙ্গে তিনি চিরকালই এক ধরণের একাত্মতা অনুভব করতেন। ‘বনপলাশির পদাবলী’ উপন্যাসটির ‘প্রসঙ্গ কথা’ইয় তিনি জানিয়েছেন --

> ...কিন্তু আমি গ্রাম সত্যি আজও দেখিনি। পিকনিক করার মত মন নিয়ে নানা জেলার নানা গ্রামে গিয়েছি পরবর্তী জীবনে। আমাদের নিজেদেরও একটি গ্রাম ছিল, থাকারই কথা, কারণ কলকাতা শহরটাই তো এই সেদিনের। গ্রাম থেকে আসা মানুষগুলোই এ শহরে এসে শহুরে হয়েছে। তফাৎ এই, সে-কথাটা

> তারা ভুলে গেছে। কয়দিন আগে পর্যন্তও শহুরে বাঙালি পরিবার এমন খুব কমই ছিলেন; যাঁদের অন্তত দু'এক একর নিদেনপক্ষে কয়েক শতাংশ চাষজমিও আদিবসত গ্রামে ভাগে বিলি করা ছিল না। এবং যার থেকে বৎসান্তে অন্তত দুটি টাকা বা দু'পালি ফসল অথবা ফলমূলটা না আসত। ... আমাদের সেই বিস্মৃত গ্রামে জীবনে আমি মাত্র তিনবার গিয়েছি। কিন্তু বিভিন্ন জেলার অনেকগুলি গ্রামে বেকার জীবনে বেশ কয়েকবার যেতে হয়েছিল। অন্তত পাঁচটি জেলার ডজন পাঁচেক গ্রামে। সেই সব অভিজ্ঞতা মিলে মিশে আমার মনে একটাই গ্রাম গড়ে উঠেছে। সেই গ্রামটির নাম বনপলাশি।[১]

ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী আলোচ্য উপন্যাসটিতে গ্রামীণ পরিবেশকে ফুটিয়ে তুলতে যথাসাধ্য প্রয়াস করেছেন। ঔপন্যাসিক নিজেই জানিয়েছেন ---

> একটি বিষয়ে লিখতে শুরু করার আগেই স্থির সিদ্ধান্ত করেছিলাম, সংলাপের ক্ষেত্রে মিথ্যাচার করব না। আমাদের বড় বড় ঔপন্যাসিকরাও দেখেছি, গ্রামের সম্পন্ন মানুষদের মুখে শহরচলতি মার্জিত ভাষার সংলাপ বসিয়ে দেন, এবং নিম্নশ্রেণীর মুখে দেন জেলা ভিত্তিক উপভাষা। আমার অভিজ্ঞতা ভিন্ন কথা বলে। গ্রামের মানুষ উচ্চবিত্তই হোক বা উচ্চবর্ণই হোক, গ্রাম্য ভাষায় কথা বলে। আমি সেই ভাষাই দিয়েছি তাদের মুখে।[২]

'বনপলাশির পদাবলী' উপন্যাসটি সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে--

> রমাপদ চৌধুরীর 'বনপলাশির পদাবলী'তে (জুন, ১৯৬২) সাম্প্রতিক পল্লীজীবনের একটি নতুন রূপরেখা ও অন্তরস্পন্দন মনকে দোলা দেয়। ইহা নিছক বস্তুবর্ণনা বা ঘটনাবিবৃতি নয়, বা আদর্শায়িত ভাবচিত্রও নয়, অথচ উভয় উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'এ পল্লীর যে হীন কৃতঘ্নতা, স্বার্থপরতা, দলাদলির প্রাদুর্ভাব ও সামাজিক উৎপীড়নের মসীময় চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, সাম্প্রতিক কালে তাহার তীব্রতা কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে। এখন গ্রামাঞ্চলের প্রধান প্রবণতা হইল নিরুৎসাহ, ঔদাসীন্য, আত্মকেন্দ্রিকতা ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের গ্রাম ছাড়িয়া শহরে বাস করার ঝোঁক।[৩]

'বনপলাশির পদাবলী' পল্লীজীবন কেন্দ্রিক উপন্যাস হলেও, পল্লীর বস্তু-সমগ্রতা বর্ণনা করাই উপন্যাসটি রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। স্বয়ং লেখক জানিয়েছেন ---

> এ উপন্যাসে আমি শুধু গ্রামজীবনকে উপস্থিত করতে চাইনি। চেয়েছিলাম স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের গ্রামজীবনের পরিবর্তিত ছবিকে পূরনো দিনের পটভূমির ওপর গড়ে তুলতে। অট্টামা সেই সেই প্রাচীনতার, পরাধীনতার, কুসংস্কারের প্রতীক; গিরিজাপ্রসাদ তথাকথিত সাফল্যের ও স্বাধীনতার ব্যররথতায় মোড়া একটি জীবন, স্বার্থ ক্ষুদ্রতা ও অকৃতজ্ঞতার ভিতর থেকে উঠে আসা গ্রামের প্রাণস্পন্দন মোহনপুরের বউ, বর্হিবিশ্বের হাতছানি উদাসের মধ্যে। উপন্যাসের চিত্রকাল প্রায় ষাট-সত্তর বছর, যদিও ঘটনাকাল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।[৪]

বস্তুত, প্রাচীন পটভূমিকায় নতুন বা পরিবর্তিত জীবনের চিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলতে হলে, এমন একটি বা দুটি চরিত্র সৃজন করতে হয়, যে চরিত্র পুরনো ধ্যান-ধারণা বা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বাংলা সাহিত্যে এ ধরণের নারী চরিত্র সৃজনের পথিকৃত ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পথের পাঁচালী'র ইন্দির ঠাকরুণ প্রাচীনত্বের ধারক-বাহক। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে সেকালের অবসান ঘটে। বিভূতিভূষণের যেমন 'ইন্দির ঠাকরুণ', রমাপদর তেমনি বৃদ্ধা 'অট্টামা'। অট্টামা কথায় কথায় ছড়া কাটেন। সেই ছড়ার মধ্য থেকে উঠে আসে লুপ্ত সংস্কৃতির ইতিহাস। 'সেকাল' আর 'একাল' মিলেই 'বর্তমান কাল'। তাই-বর্তমানকে ঠিকমতো চিনে নিতে হলে অতীতের পাঠ গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। বৃদ্ধা অট্টামা চরিত্রটি সৃজনের মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিক আমাদের অতীতের পাঠগ্রহণ করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

'বনপলাশির পদাবলী' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের গ্রামজীবনের যে পরিবর্তিত ছবিটি প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন, সেখানে পরিবর্তন খুব সামান্যই নজরে পড়ে। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে সরকার 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা'র মাধ্যমে গ্রামোন্নয়ন ঘটাতে চাইলেও তা গ্রামবাসীদের নিষ্প্রাণ রিক্ততার মধ্যে কোনো শুভ সংকল্পের বীজ বপন করতে পারেনি। গ্রামীণ মানুষেরা আজও পরম নির্ভরতার আশ্রয় খোঁজে গ্রামেরই কোনো সম্ভ্রান্ত, প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির দয়া-দাক্ষীণ্যের কাছে। বহুকাল পরে প্রবাসী গিরিজাপ্রসাদ চাকুরি

জীবন থেকে অবসর নিয়ে গ্রামে ফিরে আসছেন – এই সংবাদ বনপলাশি গ্রামের মানুষদের বিশেষ আগ্রহ-চঞ্চল করে তোলে। শিক্ষিত, শহুরে, মধ্যবিত্ত মানুষদের কাছে গ্রামীণ মানুষদের প্রবল প্রত্যাশা – "যেন সবাই মনে মনে স্বপ্ন দেখছে, গিরিজাপ্রসাদ ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে গাঁইয়ের চেহারা বদলে যাবে। আর কোনো ভাবনা থাকবে না।"[৫]

তবে, পরিবর্তন বলতে যেটুকু আমাদের নজরে পড়ে, সেটুকু আসলে গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিবর্তন, মূল্যবোধজনিত পরিবর্তন। শহরে হাস্‌কিং মিল বসেছে, গ্রামের ঘর থেকে বিদেয় নিচ্ছে ঢেঁকি। অট্টামা তাঁর দীর্ঘশ্বাস গোপন করতে পারেন না – "ঢেঁকির কাঠটার দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক ঠেলে। কুড়ুলের কোপে কোপে কাঠের চেলা তো বেরিয়ে আসছে না, যেন অট্টামার বুকের পাঁজরগুলোই ছিটকে পড়ছে একে একে।"[৬]

সংস্কৃতির পরিবর্তনের পাশাপাশি গ্রামীণ সমাজে মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটে গেছে। বি.ডি.ও প্রভাকর গিরিজাপ্রসাদকে জানিয়েছেন যে, গ্রামবাসীরা সকলে মিলে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা তুলে জমা দিলেই গ্রামে একটি স্কুল নির্মিত হতে পারে। কিন্তু, গ্রামের মানুষদের চাঁদা দেওয়ার খুব একটা উৎসাহ নেই। বরং, গিরিজাপ্রসাদের ছোটভাই গিরীনের অভিমত এই যে, চাঁদা তুলবার কোনো প্রয়োজন নেই। সরকারী আমলাদের কিছু ঘুষ দিয়ে, হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা বেশি দেখিয়ে দিলেই হল। গিরীনের কথা শুনে আহত হন গিরিজাপ্রসাদ---

> পরের পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরার মত তুচ্ছ একটা অন্যায়ের জন্যে সেদিন অনুশোচনার অন্ত ছিল না। বাবা-মা'র কাছে বকুনি খাওয়ার চেয়েও বেশি লেগেছিল আত্মসম্মানে ...... সেই বংশের ছেলে হয়ে গিরীন কিনা এত সহজে এত বড় একটা অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে চায়? ঘুষ দিয়ে কাজ হাসিল করবে? জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে রীতিমত জোচ্চুরি করবে?[৭]

গিরিজাপ্রসাদের মনে হয়—"সবাই স্বার্থপর, সবাই স্বার্থপর। কিন্তু ছাই স্বার্থটুকুই কি ভালো করে বোঝে সকলে?"[৮]

একথা ঠিক যে, পল্লীর কৃষিনির্ভর মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি আর শহুরে মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি ভিন্ন। 'বনপলাশির পদাবলী' উপন্যাসে লেখকের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, তিনি দুই ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যেকার দ্বন্দ্বের ছবিটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। গিরিজাপ্রসাদের দুই কন্যা কমলা বিমলা বাড়ির সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলেছিল বি.ডি.ও প্রভাকরের সঙ্গে। সেখানে গিয়ে পেছনে পেছনে দাঁড়িয়েছিল গিরীনের কন্যা টিয়া। তাই দেখে টিয়ার মা 'মোহনপুরের বউ' রাগে ফেটে পড়েন। টিয়াকে তিরস্কার করে বলেন—"হায়ালজ্জা বলে কিছু নেই তোমার? ওই ইনেস্পেক্টার ছোকরার সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করতে লজ্জা করে না তোমার? বয়স কমছে না বাড়ছে?"[৯] এখানেই শেষ নয়, মোহনপুরের বউ চিৎকার করে বাড়ির সকলকে শুনিয়ে বলেন ---

> ওঁরা সব শহুরে মেয়ে, লেখাপড়া করে ওই সব সভ্যতা ভব্যতা শিখেছে, জানা নেই, পরিচয় নেই, তাদের সঙ্গে হাসিতামাশা না করলে যে পাড়াগেঁয়ে বলবে ওদের ... ওদের বাপের হাঁড়ি হাঁড়ি টাকা আছে, বিয়ের সময় সব পাপ ধুয়ে দেবে টাকা দিয়ে। তোর বাপের তো সেই টাকা নেই, এমনিতেই জমি বেচতে হবে যে...।"[১০]

কিন্তু, কমলা বিমলাকে দোষ দেওয়া ঠিক নয়। গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে তারা পরিচিত নয়। নাগরিক জীবনের স্বাধীনতা নারীর জীবনকে যতটুকু স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে, গিরিজাপ্রসাদের মেয়েরা সেই শিক্ষা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ নিয়ে গ্রামে এসেছে। অন্যদিকে, গ্রামের গণ্ডিবদ্ধ জীবনে গিরীনের মেয়ের সে স্বাধীনতা নেই। বনপলাশির নিস্তরঙ্গ জীবনে কমলা ও বিমলার দমবন্ধ হয়ে আসে—"বনপলাশির জীবন যেন একটা দমবন্ধ হয়ে যাওয়া নিস্পন্দ ঘড়ি। থেমে আছে, থেমেই থাকবে। এখানে জন্ম ছাড়া আনন্দ নেই, মৃত্যু ছাড়া শোক নেই, বিবাহ একমাত্র স্বপ্ন।"[১১] শুধু কমলা বিমলাই নয়, গিরিজাপ্রসাদও বনপলাশি গ্রামে এসে ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে যেতে লাগলেন।

গিরিজাপ্রসাদ যেদিন সপরিবারে গ্রামে ফিরে এসেছিলেন, সেদিন তাঁদের আগমনকে কেন্দ্র করে অত্যন্ত আগ্রহ চঞ্চল হয়ে পড়েছিল বনপলাশি গ্রামের প্রায় সকলেই। গিরিজাপ্রসাদকে সামনে রেখে গ্রামোন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছিল সকলে। কিন্তু, একথা কেউ জানত না বা জানলেও বিশ্বাস করতে পারেনি যে, গিরিজাপ্রসাদের

সঞ্চয় সামান্য মাত্র। এতকাল ধরে তিনি যতটুকু সঞ্চয় করতে পেরেছেন, তা দিয়ে সপরিবারে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটানোই তাঁর নেই। এমতবস্থায় গ্রামের লোকেদের কথায় কথায় এটা ওটা কাজে অর্থ ব্যয় করা তাঁর পক্ষে সম্ভবই নয়। গ্রামের মানুষেরা একটা সময় ধরেই নেন যে, দশের কাজে অর্থ ব্যয় করার সদিচ্ছা নেই গিরিজাপ্রসাদের। গিরিজাপ্রসাদ স্পষ্ট লক্ষ করতে পারেন।–

> গ্রামের লোকেরা প্রথম প্রথম তাঁকে যতখানি শ্রদ্ধার চোখে দেখত, যতখানি সম্মান করে কথা বলত, ইদানিং আর তেমনটি করে না। ... কথায় কথায় আগে অনেকেই আসত যুক্তি পরামর্শ নিতে। সরকারী আপিস থেকে সারের দাম মেটাবার নোটিশ এলে, কিংবা নতুন আইনের নির্দেশ অনুযায়ী জমিজমার রিটার্ন দিতে একবার গিরিজাপ্রসাদের উপদেশ নিয়ে যেত অনেকেই। অবশ্য এখনও আসে কেউ কেউ, তবে দু-পাঁচ মিনিটের জন্যে, সে শুধু মুখটা দেখিয়ে যাওয়া। আর তেমনভাবে দু'দণ্ড বসে গল্পও করতে চায় না, পরামর্শও চায় না।[১২]

শুধু গ্রামের মানুষদের কাছেই গিরিজাপ্রসাদের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে, তা নয় – "ইদানিং গিরিজাপ্রসাদ অবশ্য লক্ষ করেছেন গিরীন তাঁকে এড়িয়ে চলে, নেহাত ডেকে প্রশ্ন না করলে সাড়া দেয় না নিজের থেকে।"[১৩] মানবিক সম্পর্কে হৃদ্যতা নয়, অর্থই যাবতীয় সম্পর্কের ভিত্তি – পল্লীর সাধারণ মানুষেরাও একথা ভাবতে শুরু করেছে। গ্রামের মানুষদের কাছে গিরিজাপ্রসাদ 'বেকার', তিনি আর 'কাজের' মানুষ নন –

> দিনে দিনে কত পরিবর্তনই না হয়ে গেল ... হৃদয় মন্ডলদের টাকার অভাব ছিল না। তিন গাঁ ছাড়িয়ে জমিজমা, খামার বাড়িতে মরাইয়ের পর মরাই বাঁধা থাকত শুখোর বছরেও। মাঠের ধান ঘরে তুলতে বেচে দিতে হত না তাদের আর পাঁচ জনের মত। তবু কই, মোড়লদের ছেলেগুলো তো গ্রামের লোকের কাছে তেমন সম্মান পেত না। গিরিজাপ্রসাদকেই সকলে সম্মান দিত। হৃদয় মোড়লও বলত তুমিই গ্রামের মুখোজ্জ্বল করেছ গিরিজা, টাকা আজ আছে, কাল নেই, শিক্ষাদীক্ষা চিরকালের। ... কিন্তু আজ যেন সব বদলে গেছে। সেই অবনীমোহন আজ মর্জাদার আসনে বসেছে। আর গিরিজাপ্রসাদ? গ্রামের লোক বুঝে নিয়েছে হয়তো, গিরিজাপ্রসাদ ব্যর্থ হয়ে, নিঃস্ব হয়ে ফিরে এসেছেন। তাই তাঁকে আর মানুষ বলেও কেউ গণ্য করে না, অপমান করতেও বাধে না তাদের।[১৪]

গিরিজাপ্রসাদের চোখের সামনেই তাঁর যাবতীয় স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যেতে লাগল –

> উপায় থাকলে এ-গ্রাম ছেড়ে, এই পঙ্কিল আবহাওয়া ছেড়ে চলে যেতেন তিনি। চলে যাবেন? আবার নতুন করে জীবন শুরু করার চেষ্টা করবেন কোথাও গিয়ে? কিন্তু কত স্বপ্ন ছিল মনে, ফিরে আসবেন, নতুন করে গড়ে তুলবেন গ্রামখান। ইস্কুল, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, কাঁদরের পুল-কত কি গড়বেন। পুকুরগুলোর পানা সাফ করাবেন, পোনা ফেলবেন। সবই স্বপ্ন রয়ে গেল। এখন মনে হচ্ছে শুধু দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পেলেই বেঁচে যান। আর মেয়ে দুটির, অমরেশের ব্যবস্থাটা হয়ে গেলেই নিশ্চিন্ত হতে পারেন, আর কিছু চাই না।[১৫]

শিক্ষিত, আদর্শবান, কর্মজীবন থেকে অবসৃত মধ্যবিত্ত এই মানুষটির জীবনের ট্রাজেডি সত্যিই অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

বিষয়-সম্পত্তি, সংসার খরচ-ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে ছোটভাই গিরীনের সঙ্গে গিরিজাপ্রসাদের মতান্তর দেখা দেয় অচিরেই –

> গিরিজাপ্রসাদ যখন প্রথম গ্রামে এসেছিলেন তখন ভিতরে ভিতরে একটা ক্ষীণ আশা ছিল, অনেক টাকা নিয়ে এসেছেন তিনি, একটা লাঙল বাড়ানো যাবে, দুটো মোষ কেনা যাবে। তারপর ভাগে দেওয়া আরও কিছু জমি ছাড়িয়ে নিয়ে খাসে আনবে। কিন্তু গিরিজাপ্রসাদের কাছ থেকে কোনও সাহায্যই তো পেল না গিরীন। এদিকে এত বড় একটা সংসারের খাইখরচই কি কম? তাও গিরীনের ওপর।[১৬]

শুধু কৃষির উপার্জন দিয়ে সংসার চলেনা। কিছু টাকা ধারদেনা করে বলগাঁ স্টেশনে পাশের গাঁইয়ের যশদের সঙ্গে মিলে একটা হাসকিং মিল বসায় গিরীন। এখন তার মনে একটা আশঙ্কা দেখা দেয়, ব্যবসার অর্ধেক ভাগ চেয়ে বসেন কিনা গিরিজাপ্রসাদ। যৌথ পরিবারের টাকায় মেশিন কেনা হয়েছে বলে যদি মামলা-মোকদ্দমা জুড়ে দেন গিরিজাপ্রসাদ, সেই আশঙ্কা থেকেই একদিন গিরীন বিষয়-সম্পত্তি ভাগাভাগির প্রস্তাব দিয়ে বসে। একদিন সামান্য কারণে পারিবারিক অশান্তি চরমে উঠলে গিরীন রাগের মাথায় স্ত্রীর দিকে এগিয়ে এসে

আঙুল তুলে বলে বসে – "আর এই তুমি – তোমাকে বলে রাখছি, আজ থেকে ওদের জন্য একমুঠো ভাতও যদি সিদ্ধ করে দাও তো আমার মরা মুখ দেখবে।"[১৭] হাঁড়ি আলাদা হয়ে গেল, দু'ভাগ হয়ে গেল রান্নাঘরখানাও। গিরিজাপ্রসাদ-গিরীনের যৌথ পরিবার ভেঙে গেল। বস্তুত 'যৌথ' পরিবারের ভাঙন কালের নিয়মেই অনিবার্য হয়ে পড়েছে। রমাপদর উপন্যাসে সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয় ভাঙন পরবর্তী প্রতিক্রিয়া, পিছুটান। পরিবার ভাগ হয়ে গেলে, মানসিক উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হলে পরে গিরীনের মধ্যে ভাবান্তর দেখা দেয় –

> বেচারি ভাবতেই পারেনি পৃথক হওয়ার মধ্যে এত ব্যথা, এতখানি বেদনা লুকিয়ে আছে। ... একটা অসীম লজ্জা এসে গিরীনকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। যেন সব দোষটুকুই তার। যেন পৃথক হওয়ার চেয়ে লজ্জা নেই। তাই কথাটা স্পষ্ট করে গ্রামের কাউকে বলতে পারেনি সে। কিংবা তাদের প্রশ্নের সামনে থেকে এড়িয়ে যাবার জন্যেই বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছে।[১৮]

লজ্জা, পিছুটান যতই দেখা দিক না কেন, যৌথ পরিবার একবার ভেঙে গেলে তা আর জোড়া লাগে না।

ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী 'বনপলাশির পদাবলী' উপন্যাসের পল্লীর সাধারণ মানুষদের নগরমুখিনতার চিত্রটিকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রায় পনেরো বছর অতিক্রান্ত হলেও সরকারের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা ঠিকমতো রূপায়িত হতে না পারার কারণে গ্রামের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি হয়নি। সঙ্গত কারণেই শহরের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন ও জীবিকা পল্লীর মানুষদের আরও প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে থাকে। সামন্ততান্ত্রিক কৃষিনির্ভরতা থেকে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত মানুষ কলকারখানা, শিল্পের দিকে ঝুঁকছে – গ্রামীণ সমাজের একটা পরিবর্তনের চিত্র এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গিরিজাপ্রসাদের ছোটভাই গিরীন যখন কৃষিনির্ভরতা কাটিয়ে শিল্পকে আশ্রয় করতে চায়, তখন তার এই উদ্যোগের মধ্যে গ্রামীণ অর্থনীতির উৎস পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পল্লীর কৃষিনির্ভর মধ্যবিত্ত শিল্পনির্ভর মধ্যবিত্ত হতে চায়। গিরিজাপ্রসাদ চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পান –

> একে একে সকলেই চেলে গেছে, চলে যাবে। হংস চাটুজ্যে চাকরির দরখাস্ত করেছে, সেও হয়তো চলে যাবে উদাস চলে যাবে ড্রাইভারির চাকরি পেলেই। দামু পালও আর কিছু টাকা জমিয়ে নাকি দোকান খুলবে বর্ধমানে। কালীমোহনের তিন বিয়ে-তিন পক্ষেরই ছেলেদের মত গিরীনও হয়তো একদিন বলগাঁর স্টেশনে দালান তুলবে ধানচালের ব্যবসা করে ... না, সারাজীবন চাকরি করে তাঁর মত দু'চারজন নিঃস্ব ব্যর্থ মানুষই হয়তো শুধু ফিরে আসবে।[১৯]

চাকুরি জীবন থেকে অবসর নেবার পর গিরিজাপ্রসাদ গ্রামে ফিরে এসেছিলেন প্রধানত দু'টো কারণে-প্রথম কারণটি অবশ্যই আর্থিক, আর-দ্বিতীয় কারণটি তাঁর চরিত্রের এক ধরণের nostalgia। চাকুরি থেকে অবসর নেবার পর তিনি দেখলেন যে, সারাজীবনের সামান্য সঞ্চয় দিয়ে শহরে জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। আর-একই সঙ্গে তিনি মনে প্রাণে চেয়েছিলেন, গ্রামে গিয়ে শৈশব-কৈশোরের ফেলে আসা দিনগুলি ফিরে পেতে। কিন্তু, যে বনপলাশি গ্রামে তিনি বড় হয়েছেন, চাকুরিসূত্রে একদিন যে গ্রাম তাঁকে ছেড়ে যেতে হয়েছিল, অবসর নেবার পর সেই গ্রামে ফিরে এসেও তিনি সেই গ্রামের সঙ্গে একাত্ম হতে পারলেন না। গ্রামের লোকেদের লোভ, স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণ মানসিকতার সঙ্গে তিনি কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারলেন না। শেষপর্যন্ত গিরিজাপ্রসাদকে গ্রাম ত্যাগ করে চলে যেতে হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'বনপলাশির পদাবলী' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী গ্রামীণ মধ্যবিত্ত বনাম শহুরে মধ্যবিত্তের একটা contrast দেখাতে চেয়েছেন। শহুরে মধ্যবিত্তের শিক্ষার গৌরব অর্থকৌলিন্যকে ছাপিয়ে উঠতে চায়। শহরে শিক্ষকতা করবার কারণে গিরিজাপ্রসাদ কিছু গুণাবলী অর্জন করেন। তাঁর জীবনটাই এই acquired qualities এর দ্বারা নিরূপিত হয়ে পড়ে। এ কারণেই তিনি গ্রামীণ মানসিকতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলেন না। প্রসঙ্গত এখানে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসটির কথা মনে পড়ে যায়। শরৎচন্দ্র তাঁর 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে পল্লীর যে সমাজচিত্র অঙ্কন করেছেন, সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, পল্লীর যাবতীয় হীনতা, রেষারেষি, কলহ-বিবাদের মূলে রয়েছে দুর্বিষহ দারিদ্র—

> সমাজের নীচতা, ভণ্ডামি, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি শরৎচন্দ্র তুলিয়া ধরিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে অভাব, বঞ্চনা ও বেদনা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহাও ইঙ্গিত করিতে ভুলেন নাই। ধর্মদাসের আত্মীয়তার আতিশয্য, দীনুর অপরিমিত লোভ, বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের সুচতুর প্রবঞ্চনা কৌশল সবকিছুর মূলে রহিয়াছে তাহাদের দুর্বিষহ দারিদ্র্য।[২০]

'বনপলাশির পদাবলী' উপন্যাসে গিরিজাপ্রসাদকেও দাঁড়াতে হয়েছে গ্রামের পঙ্কিল পরিবেশের মুখোমুখি। গিরিজাপ্রসাদ একদিন গ্রামের মানুষদের প্রতি প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে বংশীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—

> গাঁয়ের লোক খারাপ, গাঁয়ের লোক খারাপ। সকলেই যদি বোঝে, তবে হয়না কেন উন্নতি? রেষারেষি, ঝগড়াবিবাদ, স্বার্থপরতা-এসবের জন্যেই যে কিছু হবার উপায় নেই, তা সকলেই বোঝে, অথচ কেউই সেটুকু বিসর্জন দিয়ে এগিয়ে আসে না কেন? একটা পাপচক্রের মধ্যে যেন সকলে আবদ্ধ, একটা পাঁকের কুন্ডতে পড়ে আছে। উঠে আসার উপায় নেই। কেন? কেন?[২১]

বংশী তাঁকে জানায়-"একটাই পাপ গো গিরিদাদা, দারিদ্দ। ওই পাপ দূর করো, সব পাপ দূর হয়ে যাবে।"[২২] বাল্যবন্ধু বংশীর এই কথাগুলি ভালো লেগেছিল গিরিজাপ্রসাদের। তাঁরও মনে হয়েছিল কথাগুলি ষোলোআনা সত্যি। কিন্তু, একটু ভেবে দেখার পর তাঁর নিজের মনেই খটকা লেগে গেল – এই ভেবে যে, - "গাঁয়ের তুলনায় শহর তো অনেক সচ্ছল, তবু পাপচক্র থেকে শহরের লোক তো পরিত্রাণ পায়নি।"[২৩] ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী এখানে স্পষ্টতই বলতে চেয়েছেন যে, কি গ্রাম কি শহর – সর্বত্রই সমাজ ডুবে রয়েছে এক পাঁককুণ্ডের মধ্যে, কোথাও মানুষের জীবন স্বচ্ছ নয়। দারিদ্র্য ঘুঁচে গেলেই সমাজ সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এ বিষয়ে একেবারে মোক্ষম কথাটি ঔপন্যাসিক আমাদের শুনিয়েছেন বৃদ্ধা অট্টামার জবানীতে – "ও তোমার টাকা দেখতে গোল, থাকলেও গোল, না থাকলেও গোল।"[২৪] আসলে, পল্লী বা শহর – সর্বত্রই মানুষের মধ্যে সার্বিক সুস্থ মানবিক চেতনার বড়ই অভাব। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের বিশ্বেশ্বরী জ্যাঠাইমা মান করেছিলেন যে, একমাত্র জ্ঞানের আলোকেই মানুষের মধ্যে সুস্থ মানবিক চেতনার জাগরণ ঘটানো সম্ভব। এ কারণেই তিনি রমেশকে গ্রামে থেকে যেতে অনুরোধ করেছিলেন এবং 'আলো জ্বেলে দেবার' কথা বলেছিলেন।

'পল্লীসমাজে'র রমেশ শেষপর্যন্ত গ্রামে থেকে গিয়েছিলেন। কিন্তু, গিরিজাপ্রসাদ গ্রাম ত্যাগ করে চলে গেলেন। বলা উচিত-চলে যেতে বাধ্য হলেন। গিরিজাপ্রসাদ তাঁর ছোটভাই গিরীন থেকে শুরু করে গ্রামের প্রায় সকলের মধ্যে স্বার্থপরতা, হীনতা, নীচতা ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলেন না। কিন্তু, তাঁকে শেষপর্যন্ত চূড়ান্ত পরাস্ত হতে হ'ল অন্তঃপুরের একজন সাধারণ রমণীর পরার্থপরতার কাছে-উপন্যাসে যাঁর নামটি পর্যন্ত উচ্চারিত হয়নি। তিনি ছোটভাই গিরীনের স্ত্রী 'মোহনপুরের বউ'। বহু টাকা পণের বিনিময়ে গিরীনের মেয়ে টীয়ার সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল বি.ডি.ও প্রভাকরের সঙ্গে। বিয়ের পূর্বেই গিরীন পণের টাকা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু, মেয়ের 'গায়ে হলুদ' অনুষ্ঠানের একদিন পূর্বে 'মোহনপুরের বউ' জানতে পারলেন – প্রভাকরের সঙ্গে গিরিজাপ্রসাদের বড় মেয়ে বিমলার প্রণয়সক্তির কথা। অতঃপর একমাত্র 'মোহনপুরের বউ'য়ের প্রচেষ্টাতেই, তাঁদের দেওয়া পণের টাকাতেই প্রভাকরের সঙ্গে বিমলার বিয়ে হয়ে গেল। এত বড় স্বার্থত্যাগের কথা গিরিজাপ্রসাদ ভেবে উঠতেই পারেন না। অর্থহীন, ক্ষমতাহীন, মনোবলহীন গিরিজাপ্রসাদ চূড়ান্তভাবে পরাস্ত হলেন ভ্রাতৃবধূর স্বার্থত্যাগের মহিমার কাছে। ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী 'মোহনপুরের বউ'য়ের এই অসাধারণ স্বার্থত্যাগের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক জানাতে চেয়েছেন যে, সমাজ পাঁককুণ্ডে ডুবে থাকলেও, সেই সমাজের অভ্যন্তরে কোথাও না কোথাও আদর্শ, মূল্যবোধ এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। কিন্তু, স্বার্থমগ্ন মানুষ সেই আদর্শ, মূল্যবোধ চিনে নিতে পারে না, তাকে মূল্য দিতে জানে না। জীবনযুদ্ধে পরাস্ত গিরিজাপ্রসাদ পুনরায় জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্যে গ্রাম ত্যাগ করে চলে গেলেন। গিরিজাপ্রসাদ যেদিন ফিরে এসেছিলেন-বনপলাশির গ্রামের মানুষদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। কিন্তু, আজ যখন পুনরায় তিনি বগ্রাম ত্যাগ করে গেলেন, গ্রামের মানুষদের মধ্যে কোনো চাঞ্চল্য দেখা গেল না। গিরিজাপ্রসাদের নিঃস্ব, রিক্ত জীবনের ট্রাজেডি সত্যিই বেদনাদায়ক। মানুষের চাওয়া-পাওয়ার হিসেবের মধ্যে বুঝি চিরকালই একটা গরমিল থেকে যায়।

'বনপলাশির পদাবলী' উপন্যাসটি আদ্যোপান্ত পাঠের পর আমাদের মনে একটা সংশয় দেখা দেয়। উপন্যাসটিতে গিরিজাপ্রসাদের এই যে পরাজয় বা পরাভব দেখানো হ'ল-সত্যিই কি তা পরাজয়? - না ঐতিহাসিক নিয়তি? বস্তুত, আমাদের দেশেও প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক শিক্ষার একটি প্রধান শর্ত ছিল একদল ইংরেজ শাসনের সমর্থক মানুষ তৈরি করা, যারা এদেশীয় হয়েও কাজে-কর্মে ইংরেজদেরই সমর্থন করে চলবে। এর ফলে গ্রাম থেকে শহরে শিক্ষা নিয়ে যারা যায়, তারা ক্রমে দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একটা নূতন নৈতিকতার আবহে নূতন কিছু মূল্য চেতনার মন্ত্রে তাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। এর ফলে দেশজ সংস্কৃত, পরিস্থিতির সঙ্গে তাদের যোগ থাকে না। উল্টোদিকে, বাংলাদেশের গ্রামগুলির পরিবর্তন দীর্ঘদিন তেমন একটা হয়নি। এর ফলে শহরে গিয়ে তার আদর্শে গড়ে ওঠা মানুষ গ্রামে ফিরে গিয়ে স্বস্তি পায় না। শহর ও গ্রামের জীবন একটা নীতি, আদর্শ ও সাংস্কৃতিক বিভাজিকা দিয়ে পৃথক হয়ে পড়ে। বাংলা উপন্যাসে রমাপদবাবুর গিরিজাপ্রসাদ বিগত শতাব্দীর সপ্তম দশকের একটি উদাহরণ। তার পূর্বেকার বিশিষ্ট উদাহরণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শশী (পুতুল নাচের ইতিকথা)। শশী সারাজীবন গ্রামে থেকেও একদিনের জন্যেও গ্রামজীবনের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি। তার মনে সব সময়েই সক্রিয় ছিল অন্য ভাবাদর্শ। গিরিজাপ্রসাদের পক্ষেও সেই experiment সফল হয়নি। এ কারণেই আমাদের মনে হয়, উপন্যাসের শেষে গিরিজাপ্রসাদের পরাজয় এবং গ্রাম ত্যাগ করে চলে যাওয়াটা বোধহয় এক ঐতিহাসিক নিয়তি।

'বনপলাশির পদাবলী' উপন্যাসটির বিষয়বস্তুর মর্মকথা সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মূল্যায়নে -

> গ্রামগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। যে কারণেই হৌক পল্লীর সেই শান্ত রসাস্পদ জীবনে ভাঙ্গন ধরিয়াছে, জীবন অশান্ত, তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। একটা কারণ, - বোধহয় শহরের হাতছানি তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে। পল্লী রাখাল আর বাঁশের বাঁশিতে ফুঁক দিয়া তৃপ্তি পায় না। মোটর-বাস-এর হর্ণ তাহাকে ডাক দিয়াছে। পাঁচন বাড়িতে তাহার হাত উঠে না, স্টিয়ারিং ধরিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়াছে। ধানের জমিতে গৃহস্থের দিন চলে না, তাহাকে হাস্‌কিন্‌ মেসিনের জিন্য টাকা জোগাড় করিতে হয়। এমনি দিনে পশ্চিমের কেনা চশ্‌মা চোখে দিয়া ব্লক অফিসার তাহার জীপ লইয়া উপস্থিত হন। গ্রামের উন্নতির নূতন পরিকল্পনা শোনান। ... এই যুগসন্ধিক্ষণের একটা জীবন্ত ছবি তোমার বনপলাশির পদাবলী। সারা বাঙ্গালার একটা পটপরিবর্তনের প্রতীক।[২৫]

সন্দেহ নেই, পণ্ডিত সমালোচকের বিশ্লেষণে 'বনপলাশির পদাবলী' উপন্যাসের প্রকৃতিটি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। কিন্তু, একটা বিষয়ে সংশয় থেকেই যায় - গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনা আদৌ সফল হবে কিনা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির মাত্র দেড় দশক সময়ের মধ্যেই প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতি বাসা বাঁধতে শুরু করেছে, এই চিত্রটিও উপন্যাসে প্রতীকায়িত হয়েছে। সরকারী আমলাদের ঘুষ দিলে স্কুলবাড়ি নির্মিত হয়, কারও অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে - থানার দারোগাকে কিছু ঘোষ দিলেই মৃতের দেহের ময়নাতদন্তও রদ হয়ে যায়।

তথ্যসূত্র :

১। চৌধুরী রমাপদ, 'প্রসঙ্গ কথা', 'বনপলাশির পদাবলী', উপন্যাস সমগ্র (৪), প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৯৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৯, পৃষ্ঠা - ৫১৭-১৮।

২। তদেব। পৃষ্ঠা - ৫১৮-১৯।

৩। বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', পুনর্মুদ্রণ ২০০৪-০৫, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩।

৪। চৌধুরী রমাপদ, 'প্রসঙ্গ কথা', 'বনপলাশির পদাবলী', উপন্যাস সমগ্র (৪), প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৯৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৯, পৃষ্ঠা - ৫১৯-২০।

৫। চৌধুরী রমাপদ, 'প্রসঙ্গ কথা', 'বনপলাশির পদাবলী', উপন্যাস সমগ্র (৪), প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৯৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৯, পৃষ্ঠা - ১৩।

৬। তদেব। পৃষ্ঠা - ৬৫।

৭। তদেব। পৃষ্ঠা - ৫৫।
৮। তদেব। পৃষ্ঠা - ৪২।
৯। তদেব। পৃষ্ঠা - ৪০।
১০। তদেব। পৃষ্ঠা - ৪০।
১১। তদেব। পৃষ্ঠা - ৮১।
১২। তদেব। পৃষ্ঠা - ৮৪।
১৩। তদেব। পৃষ্ঠা - ৮৮।
১৪। তদেব। পৃষ্ঠা - ৯৭।
১৫। তদেব। পৃষ্ঠা - ৯৮।
১৬। তদেব। পৃষ্ঠা - ১৩২।
১৭। তদেব। পৃষ্ঠা - ১৩৩।
১৮। তদেব। পৃষ্ঠা - ১৩৪।
১৯। তদেব। পৃষ্ঠা - ১৩৮-৩৯।
২০। ঘোষ ড. অজিতকুমার, 'শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার', দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা ১৩৫।
২১। চৌধুরী রমাপদ, 'প্রসঙ্গ কথা', 'বনপলাশির পদাবলী', উপন্যাস সমগ্র (৪), প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৯৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৯, পৃষ্ঠা - ১৬৯।
২২। তদেব। পৃষ্ঠা - ১৬৯।
২৩। তদেব। পৃষ্ঠা - ১৬৯।
২৪। তদেব। পৃষ্ঠা - ১৭৭।
২৫। চৌধুরী রমাপদ, 'প্রসঙ্গ কথা', 'বনপলাশির পদাবলী', উপন্যাস সমগ্র (৪), প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৯৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৯, পৃষ্ঠা - ৫২০।

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়, বাগডোগরা, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ।